

বাহালাদ মল্লিকম্বালাদ লম্বালিক

সাহিত্য পত্রিকা

মল্লিক মল্লিক : মল্লিক মল্লিক : মল্লিক মল্লিক

Vol. 32 | No. 3 | 1989



Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পঞ্চাশের দশকে চল্লিশের কবি দায়বদ্ধতার ধারায় পশ্চিম
বাংলার কবিতা

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাসুদুজ্জামান
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/ sp.v32i3.9
Pages	217-238
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণ্যশের দশকে চল্লিশের কবি

দাম্ববদ্ধতার ধারায় পশ্চিম বাংলার কবিতা

মাসুদুজ্জামান

পশ্চিম বাংলার চল্লিশের কবিদের বিরুদ্ধে একটা স্বীকৃত অভিযোগ এই যে, তাঁরা তিরিশের কবিদেরকে কাব্যপ্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে বিষ্ণু দে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সামাজিক বাস্তবতা এবং অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর গীতল, আবেগধর্মী কাব্য সৃষ্টিই তাঁদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যে-নতুন, অভিনব কাব্যরূপ তিরিশের কবির সন্ধান করছিলেন, চল্লিশের কবির তাঁদের সেই অভিযাত্রায় পালন করেছেন সহযোগী ভূমিকা। তবে তিরিশের কবিদের কাছ থেকে পাওয়া বহু ব্যবহৃত সহজ উপকরণ নিয়ে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন নি তাঁরা। এ সম্পর্কে কবি অরুণ কুমার সরকার লিখেছেন প্রাথমিক পর্যায়ে চল্লিশের কবিকুল ‘তিরিশের লেজুড় হিসাবেই’ কাব্য চর্চা শুরু করেছিলেন এবং ‘আপাতত অবস্থাটা কতকটা তাই ছিল বৈকি। কেননা, নিজের-নিজের অনুভব এবং বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী চল্লিশের কবির চিন্তাভাবনার দিক থেকে তিরিশের কবিদেরই বিভিন্ন জীবনদর্শনকে অনুসরণ করেছিলেন। তবুও যে সেদিন তাঁদের পৃথক করে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল তা তাঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং শব্দচয়নের সাহসী আধুনিকতার গুণেই’।^১ তবে এই গুণ বা স্বকীয়তা চল্লিশের কবির খুঁজে পান বস্তুত চল্লিশের দশকে নয় পরবর্তী পঞ্চাশের দশকে, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য পর্বে। এই দশকে কী প্রকরণ, কী বিষয়বস্তু, উন্ময় ক্ষেত্রেই তাঁরা অর্জন করেন স্বকীয় বিশিষ্টতা।

অরুণ মিত্রের (জ. ১৯০৯), উৎসের দিকে (১৯৫৪); মণীন্দ্র রায়ের (জ. ১৯১৯) অন্যপথ (১৯৫১), কৃষ্ণচূড়া (১৯৫৫), অমিল থেকে মিলে

(১৯৫৮), ও মুখের মেলা (১৯৫৯) ; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৭) রাণুর জন্য (১৯৫১), উলুখড়ের কবিতা (১৯৫৪), মৃত্যুতীর্ণ (১৯৫৪), লখিন্দর (১৯৫৪) ও জাতক (১৯৫৯) ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (জ. ১৯১৯) ফুল ফুটুক (১৯৫৭) ও যত দূরেই যাই (১৯৬২); মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (জ. ১৯২০) মেঘ রশ্মি ঝড় (১৯৫১) ও কটি কবিতা ও একলব্য (১৯৫৯) ; রাম বসুর (জ. ১৯২৫) তোমাকে (১৯৫১), যখন যজ্ঞা (১৯৫৫) ও দৃশ্যের দর্পণে (১৯৫৬) ; সিদ্ধেশ্বর সেনের (জ. ১৯২৪), কবিতা (১৯৮৩, রচনাকাল ১৯৪৫-৬৭) ; অরুণকুমার সরকারের (১৯২১-৮০) দূরের আকাশ (১৯৫২) : নরেশ গুহর (জ. ১৯২৪) দরন্ত দুপুর (১৯৫১) : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (জ. ১৯২৪) নীল নির্জন (১৯৫৪) ও অন্ধকার বারান্দা (১৯৬১) ; রমেন্দ্র কুমার আচার্য চৌধুরীর (জ. ১৯২২) আরশি নগর (১৯৬২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই কাব্য পরিণতির স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। উপযুক্ত তালিকায় সম্মিলিত কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থ যদিও পঞ্চাশের সময়-পর্বে প্রকাশিত হয়নি তবু ঐ সব কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল এই কালখণ্ডে সীমাবদ্ধ বলে পঞ্চাশের কবিতা হিসেবেই সেগুলি আলোচনার দাবী রাখে।

পূর্ববর্তী চল্লিশের দশকে আবির্ভূত নতুন প্রজন্মের কবিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতার। পঞ্চাশের দশকের ঐ দায়বদ্ধতারই সম্প্রসারণ লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে চল্লিশের কবিদের রচনায়। জটিল যুগচৈতন্যের প্রভাবে কবিচেতনা এই সময়ে হয়ে ওঠে কিছুটা অসরল, বন্ধিম ও তীক্ষ্ণধী। পূর্ববর্তী দশকের সহজ, সরল একমুখী আশাবাদের পরিবর্তে সমাজ সম্পৃক্ত অস্তিবাদী কবিতায় শোনা গেল বেদনাদ্র' ক্ষুব্ধ কবিচিত্তের সক্রিয় প্রতিধ্বনি। কখনো বা ফুটে উঠলো স্বৈদ ও শোণিতের অবিরল ক্ষরণ, অন্তহীন সংগ্রামের ক্লিষ্ট প্রতিচ্ছবি। কেউ কেউ কণ্ঠস্বরে নিয়ে এলেন কর্কশ সুর, কেউ আবার প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে নাটকীয়তা বর্জন করে অস্ফুট আর্তস্বরে কবিতায় পুরিত করে দিলেন সামাজিক প্রসঙ্গসমূহ। কারুর কবিতায় গৃহীত হলো খণ্ড কাহিনী, পথচলতি টুকরো মন্তব্য, সাধারণ কোনো পরিস্থিতি (Situation) কিংবা কাটা-কাটা বাক্যে আলাপচারিতার আটপৌরে ভঙ্গি। ভাষায় স্বকীয়তা সৃষ্টির জন্য কেউ কেউ কবিতায় নিয়ে এলেন সংকেত,

আবেগের গুঢ় ইশারা। মিতকথন ও গান্ধীর প্রয়োজনে উপনিষদীয় শ্লোক বা শ্লোকের অনুরূপ পংক্তির ব্যবহারও ঘটলো কোনো কোনো কবির রচনায়। সামাজিক বিশ্বযাবলির মধ্যেও ঢুকে গেল একান্ত ব্যক্তিগত অনুষ্ণ—করুণ রঙিন প্রেম, খণ্ড কোনো অনুভূতি, স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল নিসর্গ, স্পৃহাশূন্য জীবন, বিষাদ, নৈরাশ্য প্রভৃতি। অর্থাৎ এই পর্বে ছকবাঁধা যান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাবনার কাব্যরূপ দানে আর উৎসাহ বোধ করেন নি কবিরা। অথচ এখানে স্মরণ করতে পারি যে, কবির কবিসত্তা ও রাজনৈতিক সত্তার অভিন্নতাই ছিল পূর্ববর্তী দশকের কবিতার প্রধান নান্দনিক ভিত্তি। এ কারণেই সমর সেনের তিন-পুরুষ কাব্যগ্রন্থে ‘সমসাময়িক প্রগতিশীল শ্রেণীর সঙ্গে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের একাত্মতা’^২ ঘটেনি দেখে কবি-সমালোচক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ‘উগ্রতর স্বাতন্ত্র্যবাদী’ কবি হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে। এই আকৃমণের কারণ হল অন্যান্য অনেকের মতো তিনিও ভেবেছেন যে রাজনৈতিক কর্মসূচীর সক্রিয় ‘অনুসরণ’ই হচ্ছে আধুনিক কবিতার লক্ষ্য। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে সমাজচেতন্য ও ব্যক্তিচেতন্যের এই অভিন্ন ধারণাটি ক্রমশঃ বিস্মৃষ্ট হয়ে যেতে থাকে। বিস্মৃষ্ট উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তে কবিতার শৈল্পিক উৎকর্ষ রক্ষার দিকেই নিবদ্ধ হয়ে ওঠে কবিদের মনোযোগ : ‘পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্টদের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চেতনা, শিল্পের নান্দনিক আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার একান্ত অভাব, যখন দেখা দেয় তখন থেকে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে এ থেকে সরিয়ে নিই।’^৩ উল্লিখিত এই উদ্ধৃতি থেকে এ সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছানো যায় যে, সমকালীন আধুনিকতা আসলে পারিপার্শ্বিক অনুষ্ণের পাশাপাশি ব্যক্তির অমোঘ ভূমিকাকে স্বীকার করে নেয়। কবির নিজের ব্যক্তিক অনুভূতিকে দেয় যথাযথ স্বীকৃতি। এমনকি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিনেও ব্যক্তিহাদয়ের দাবী অস্বীকার করা যায় না এরকম কথাও বলতে গুনলাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।^৪ অরুণ মিত্র তো সরাসরি জানালেন : ‘না, যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য নয়। হৃদয় দিয়েই আমি বাঁচতে চাই’।^৫

সমকালীন বিশ্বকবিতার চারিত্র্য পর্যবেক্ষণ করলেও দেখতে পাব যে যুদ্ধোত্তর কাল থেকে শুরু করে এই শতাব্দীর পঞ্চম দশক

পর্যন্ত যে-সব রাজনৈতিক-সামাজিক কবিতা লেখা হচ্ছিল তাতেও প্রশমিত হয়ে আসছিল মতাদর্শগত উগ্রতা। স্টালিনের কঠিন নিয়ন্ত্রণ অবসিত হয়ে গেলে ইভতেশেকো (জ. ১৯৩৩) ও ভজনেসেনস্কি (জ. ১৯৩৩) সাম্যবাদে গভীরভাবে বিশ্বস্ত থেকেও কবিতায় গ্রহণ করলেন আত্মকথনের ভঙ্গি। রাজনৈতিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও গৃহীত হলো শৈল্পিক স্বাধীনতা। ইভতেশেকোর বিরুদ্ধে অবশ্য উঠেছে লেলিনবাদ বিরোধিতার মারাত্মক অভিযোগ, তবু তাঁর কবিতায় যে সুগভীর দেশপ্রেমের স্বাক্ষর উপস্থিত, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যদিও কবিতাকে তিনি সমাজরূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন নি সেইভাবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি এক ফরাসী সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলা তাঁর একটি উক্তি : ‘I never write to order and work to no plan of production’।^৬ আসলে ইভতেশেকোর মতে কবিতার নিজস্ব গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে অপব্যয় কবিতার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। কবিতায় নিজের কথাই বলতে হবে কবিকে এবং এটাই হচ্ছে একজন প্রকৃত সাম্যবাদী কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য।^৭ পাস্তারনাকের দ্বারা ঈষৎ প্রভাবিত ইভতেশেকোর মতো ভজনেসেনস্কিও এই মতবাদের সমর্থক। বস্তুত এরা দুজনেই স্টালিন পরবর্তী রুশ কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেক দূর পর্যন্ত, সামাজিক দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও সময়ের দ্বারা ব্যবহৃত হন নি, কবিতায় খচিত করে দিয়েছেন আত্মমুদ্রা। এখানে আরো দুজন প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের একজন চিলির কবি পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) এবং অন্যজন কিউবার নিকোলাস গিয়েন (জ. ১৯০৪)। ইউরোপীয় কাব্যধারা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত সাম্যবাদী গিয়েনের কবিতা যে শুধু জননন্দিত তাই নয় সর্বহারা শ্রেণীর জন্য রচিত হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রায় সকল সচেতন ও সংবেদনশীল কবি সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিক চেতনাকে এক বিমিশ্রবোধে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন তাঁদের রচনায়। কবিতার কাব্যমূল্য রক্ষার জন্যই তাঁদের কবিতায় সাধন করতে হয়েছে সামাজিক ও আত্মপ্রসঙ্গের এই নিপুণ সংশ্লেষ।^৮ অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় সমস্ত দায়বদ্ধ কবি কবিতার শিল্পমূল্য, রাজনীতি ও জনগণের

মধ্যকার ভাবনাগত ব্যবধান দূর করা, নিজস্ব কাব্যবীক্ষণ সৃষ্টি ও সংবেদনার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন সমানভাবে।^৯ ফলত পঞ্চাশের দশকের রাজনীতিপুণ্ডিত দায়বদ্ধ আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে সমকালীন বিশ্বের দায়বদ্ধ কবিতার রয়েছে একটা আপাত সাদৃশ্য, যে-সাদৃশ্যের কারণে পঞ্চাশের সমাজসচেতন কবিতা সমীপবর্তী হতে পেরেছে বিশ্বকবিতার।

পঞ্চাশের দশকে চল্লিশের যে-সব আধুনিক বাঙালি কবির রচনায় এই দায়বদ্ধতার পরিচয় সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন তিনজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ মিত্র।

কবিজীবনের আবির্ভাব লগ্ন, অর্থাৎ চল্লিশের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তিরিশের মননশাসিত হতাশাধর্মী কবিতার বিপ্রতীপে রাজনীতি-নির্ভর, জীবনঘনিষ্ঠ কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতায় সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এক নতুন ধারার। এ ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে কিছুটা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেও শ্লোগানধর্মী বেগবান উচ্চকণ্ঠের ব্যবহারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অনন্য। পঞ্চাশের দশকেও তাঁর কবিকৃতির এই স্বতন্ত্রতা বিশেষভাবে চোখে পড়বে আমাদের। মূল লক্ষ্য স্থির থাকা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ বিপরীতধর্মী হয়ে উঠবে তাঁর।

পূর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লক্ষ্য ছিল সমষ্টিবোধে উজ্জীবিত হয়ে ব্যক্তিজাগরণের মাধ্যমে মানবমুক্তি অর্জন। কিন্তু এই পর্বে আপাতভাবে ব্যক্তিই হয়ে উঠতে চাইছে তাঁর কবিতার কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তিবোধ থেকে সমষ্টিবোধে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অর্জন করতে চাইছেন রহস্তর মানবমুক্তি।^{১০} ফলে ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হয় তাঁর কাব্যদৃষ্টি। আমিহ্নকে নানাভাবে নানা অনুশঙ্গে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। কখনো ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে কখনো কোনো খণ্ড ঘটনায় কিংবা কোনো বিশেষ পরিবেশ (situation) সৃষ্টি করে গেঁথে তোলেন তাঁর বক্তব্য। বস্তুত-পক্ষে কবি চেতনার এই আত্মখণ্ডন এবং সেই বিচূর্ণ সত্তাকে পুনরায় একক ও সমষ্টিবোধে সমাহৃত করার মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিচেতনার মৌলসূত্র।

এ কারণেই তাঁর কবিতায় এই পর্বে দেখা যাবে বিভিন্ন চরিত্রের প্রাধান্য, যাঁরা পরোক্ষভাবে আমিত্বেরই নানারূপ, কবিচেতনার বিচূর্ণ প্রতিনিধি। এই সব চরিত্রকে ঘিরেই বলম্বিত হয়ে উঠবে তাঁর জীবনের সমষ্টিগত ভাবনা। পাগল বাবরালি, আকালের মেয়ে সালেমন (সালেমনের মা), আত্মহত্যাপরায়ণ জনৈক ব্যক্তি (অগ্নিগর্ভ), কমলা কুড়ানো বুড়ী, আসন্ন সম্ভবা বউ (একটি লড়াকু সংসার), গাঁয়ের ও শহরের হাড়কালি মানুষ (যেতেই হবে), মিছিলের সেই মুখ (লাল টুকটুকে দিন), জোলাদের ছোট বউ, নববিবাহিত ছেলেটা (বাসি মুখে), রূপকথার পারুল বোন ও সাত ভাই চম্পা (পারুল বোন), সংবেদনশীল কবি (ছিটমহল), আত্মজা পুপে (পুপে), ঐতিহাসিক চরিত্র স্তালিন (কমরেড স্তালিন) মামা-ভাগ্নে (মামা-ভাগ্নের গল্প), মুরোদহীন ভাড়াটে (সহজিয়া), অবৈধ শিশু সন্তান (ড্যাং ড্যাং করে) কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে (ফুলফুটুক), ইহকাল-পরকাল খোয়ানো লোক (লোকটা জানলই না) ইত্যাদি বিচিত্র চরিত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হতে শুরু করলো কবির সংগ্রামী ক্ষয়িষ্ণু জীবন-প্রতিরোধী ও উজ্জীবনধর্মী চেতনা। যেমন সালেমন ছিন্নমূল, অনিকেত অখচ সংগ্রামশীল মানুষের প্রতীক। মাকে অশ্রুশ্রবণের যে-আতি তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে সেই মা যেন মাতৃভূমির প্রতিভূ, সংগ্রামরত নিপীড়িত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী, পরম-নির্ভর আশ্রয়স্থল :

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে

পিচুটি-পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে

তোমাকে ডাকছে শোনো,

সালেমনের মা—

এই আকালের মেয়ে তোমার

আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে

তোমাকে সে খুঁজছে ॥

(সালেমনের মা, ফুল ফুটুক)

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যে-সংগ্রাম চলছে সেই সংঘর্ষের স্বরূপ উৎকীর্ণ হয়ে আছে এক দাবাড়ু কর্তৃক বিপক্ষ অন্য এক দাবাড়ুকে সতর্কীকরণের মধ্যে :

চাল ফেরত নেই,

সারা পৃথিবীটাকে বাজী রেখে

আমাদের খেলা ।

ওদের বল ওরা যেভাবেই সাজাক
আমরা আড়াই-ঘরের পাল্লায়
ওদের পাব।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

(ঘোড়ার চাল, যত দূরেই যাই)

সহজেই ধরে নিতে পারি এই সংঘাতে নিপীড়িত মানুষেরই পক্ষাবলম্বন করবেন কবি। নিজেই বলেছেন : ‘মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে লড়াই তাতে আমি নিরপেক্ষ নই। কথাগুলোকে অস্ত্র করে আমি মানুষের হাতে তুলে দিতে চাই’।^{১১} এই ধারণা থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে প্রতিপাদ্য করে তোলেন তাঁর কবিতায়। ‘পা রাখার জায়গা’ নামক কবিতাটিতে লক্ষ্য করি অবক্ষয়-পীড়িত, ভঙ্গুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত একজন বিপর্যস্ত মানুষ এক সময় অনুভব করে যে তারও অধিকার আছে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। এ জন্য সে এতদিন নিজেকে দুর্বল, ভীরু মনে করে এলেও এবার এগিয়ে এলো নিজের সীমিত শক্তির ব্যবহারে :

হাতটা সরিয়ে নিন না, মশাই।

ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—

দয়া ক’রে

স্যার, একটু পা রাখার জায়গা।

(পা রাখার জায়গা, যত দূরেই যাই)

বস্তুতপক্ষে এই আত্মোপলব্ধিই এই পর্বে প্রধান হয়ে উঠছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। ‘মেজাজ’ কবিতার সন্তান-সন্তবা কালো অলুক্ষুণে রণরঙ্গিণী বধুর চরিত্রে ভিন্নতর এক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায় এই চেতনারই সম্প্রসারণ। আফ্রিকায় সংঘটিত কালো মানুষদের মুক্তি-সংগ্রাম ও অহং চেতনাকে ঐ বধু-চরিত্রের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করে তোলেন কবি। আবার দায়বদ্ধ কবিতার যে একটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ মানবিকতা, ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কবিতায় লক্ষণীয় তার শৈল্পিক রূপায়ণ। আপাত দৃষ্টিতে রূপহীন ‘কালোকুচ্ছিত’ আইবুড়ো একটা মেয়ে কিন্তু তারও যে বিবাহ সম্পর্কিত

অনুরাগ থাকতে পারে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সে-ও যে আন্দোলিত হতে পারে, সেটাই উপজীব্য হয়ে উঠেছে এই কবিতায়। আসলে পারিপার্শ্বিক জীবন ও ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতে সৃষ্ট মানবিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সফল রূপায়ণই হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পর্বের কবিতার বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কেবল ব্যক্তিকে নির্ভর করে নয়, বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুসত্তার মধ্য দিয়েও দায়বদ্ধতার সুত্রটিকে তুলে ধরেন তিনি। ‘ফলশ্রুতি’ কবিতায় দেখা যায় সেই বোধেরই উল্লেখ। আসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ‘সমস্ত সময় মানুষের দিকে ফেরানো’।^{১২} ফলে তাঁর কবিতায় মানবিক চেতনা, দেশাত্মবোধ, রাজনীতি, সামগ্রিকভাবে পরম্পরিত হয়ে যায়।^{১৩} আর মানুষের জীবন যেহেতু তত্ত্বের ছকে বাঁধা নয়, দেশকালের পরিবেশে এই জীবন জটিল আকার ধারণ করতে পারে সহজেই, ফলে মাঝে-মাঝে নেতি-বোধে আব্রান্ত হন তিনি :

রাস্তার সারিবদ্ধ লাঠির শরশয্যা,
 দু-নলের অনলে দুমদাম
 মুখাণ্ণি ;
 তারপর কাঁদুনে গ্যাসের মত
 ধোঁয়ার কালো গাড়ি
 আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে ।
 (গণনা, যত দূরেই যাই।

প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সংগ্রামী শপথে দৃপ্ত মানুষের ওপর শাসকশ্রেণীর যে তীব্র অত্যাচার নেমে এসেছিল, এ হলো তারই ছবি। লক্ষ্য করবার বিষয়, বেদনায় ক্লিষ্ট, বিপর্যস্ত সরল জীবনই হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান প্রেরণার উৎস। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য অর্থাৎ দায়বদ্ধতা থেকে কখনই চ্যুত হন না তিনি। একটি কবিতায় একজন কবির যে-বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, এ প্রসঙ্গে সেই কবিতাটি আংশিকভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মস্বরূপ উন্মোচনেও সহায়ক হতে পারে :

এক কবি।

তিনি পরতেন চুপি চুপি

লম্বা মেঘের পাজিমা।

বাড়বাড়ার ফুঁ দিয়ে

যখন ইচ্ছে বজ্জে

বাজাতেন তিনি

প্রকান্ড এক দামামা—

পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই

মাটিতেই তাঁর

ছিল পা।

(ছিটমহল, ফুল ফুটুক)

চল্লিশের তুলনায় পঞ্চাশের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার এই যে-রূপান্তর, তাতে তাঁর মৌল জীবনদর্শন স্থির থাকলেও, কবিতার আঙ্গিক ও ভাষায় ঘটে গেছে বিপুল পরিবর্তন, প্রকাশভঙ্গিতে এসেছে নতুনত্ব। রাজনৈতিক মতাদর্শ অথবা ব্যক্তি-জাগরণের উন্মোচনে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, টুকরো টুকরো গল্প, কথোপকথনের ভঙ্গি গৃহীত হওয়ার ফলে তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করি প্রতিদিনের মুখের ভাষা, ছোট ছোট বাক্য, দৈনন্দিনতার দ্বারা স্পৃষ্ট প্রতিমার অজস্র ব্যবহার। এই নতুনত্ব আবার কবিতার ভাষা-শরীর থেকে সঞ্চারিত হয়েছে কবিতার প্রসঙ্গ বা বস্তুবো। বস্তুত বিষু দে কথিত দ্বন্দ্বিক চেতনাসূত্রেই গড়ে উঠেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যজগৎ। সামান্য একটি-দুটি রেখায়, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত কিংবা নিপুণ ছন্দবিন্যাসে এই ধরনের ভাষাতেই সমস্যা-সঙ্কুল জটিল জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রায় সিদ্ধহস্ত বলা যায় :

সময়ের গলায়

এখনও আড় হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা।

ও বেড়াল, তোমার পায়ে পড়ি

খুলে দাও না।

এত সব শুনেটুনেও—

তেমনি গোঁজ হয়ে বসে থাকল বেড়ালটা।

হাতের কশিজতে কালো কাপড় বেঁধে

আমার চেয়েও ভ্যাঙা

এক চোয়াড়ে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

সামনে কী আছে

কিছু ঠা'হর করা যায় না।

(সন্ধ্যামণি, ফুল ফুটুক)

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের এই অন্বেষণ ও তার সার্থক প্রয়োগের পরিণামেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে যায় প্রতীক ও ব্যঞ্জনার স্তরে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি লক্ষ্য করলেই আমরা তাঁর সাফল্যের স্বরূপ বুঝতে পারবো : ‘আমি এ পর্যন্ত ভাষার ভেতর দিয়ে যা দিয়েছি, তার কিছুই আমার ভেতর থেকে আসেনি। সমস্তটাই আমার বাইরে থেকে পাওয়া। যা চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি—তাই ফুটিয়েছি মুখের ভাষায়’।^{১৪} তবে ভাষার এই বিবর্তন সুত্রটি যে পরিবর্তিত দেশকালের সঙ্গে যুক্ত তার ইঙ্গিত রয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই একটি আগাতসরল অথচ সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে : ‘মানুষের হাতিয়ার বহিঃপ্রকৃতিতে বদলায় আর অন্তঃপ্রকৃতিতে বদল আনে মানুষের ভাষা’।^{১৫} দায়বদ্ধতার প্রতি সমর্পণ সত্ত্বেও পূর্ববর্তী দশকে রচিত কবিতার তুলনায় তাঁর এই পর্বের কবিতা তাই অনেক বেশি দ্বন্দ্বমুখর, আত্মতার সংকটে দীর্ণ এবং ব্যক্তিগতভাবে অভিনব।

দায়বদ্ধতার উন্মোচনে পঞ্চাশের দশকে ব্যক্তি ও সমাজের জটিল দ্বন্দ্ব প্রভাবিত হয়েছেন চল্লিশের অন্য আর এক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চল্লিশের একরৈখিক সমষ্টিচেতনা থেকে তাই কিছুটা দূরে স্থিত তাঁর এই পর্যায়ের কবিতা : ‘আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে। সেখানে আজও যাঁরা জলসিঞ্চন করছেন তাঁরা সবাই দলছুট একক কবি—যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ’।^{১৬} এই উক্তিটির অনুসরণসূত্রেই আমরা লক্ষ্য করি জীবনানন্দের আত্মগতবোধ ও অস্তিচেতনা^{১৭}, নজরুলের রোমান্টিক কারুণ্য ও প্রলয়মত্ততা^{১৮} এবং প্রতিকূলতার মুখেও রবীন্দ্রনাথের স্থির প্রত্যয়বোধের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব চেতনান্যাক। আর এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বোধ বা অনুভববেদ্যতা : ‘আমি কবিতা লিখি নিজস্ব অনুভব থেকে’।^{১৯} কিন্তু পঞ্চাশের দেশকালগত পরিবেশ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব কবিচেতনার অনুকূল ছিলো না বলে তিনি এ সময়ে অচঞ্চল প্রত্যয়বোধে জ্বলে উঠতে পারেন নি তেমনভাবে। ফলে এই

পর্বের কবিতায় অনেকটা যেন জীবনানন্দের অনুসরণে শূন্যতা, অবসাদ, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতাবোধের আশ্রয় নিতে দেখি তাঁকে। হয়তো অনির্গত মধ্যবিত্ত মানসচেতনার সেটাই ছিল অনিবার্য পরিণাম। আপন অন্ত-লোকে কিংবা বহির্জাগতিক স্বদেশভূমিতে তাই তিনি খুঁজে পেলেন না তাঁর অভীষ্ট আশ্রয়। রোমান্টিক অভীপ্সার বিনয়্র আশ্রয়ে গাঢ় রূপ-বন্ধে দ্রুত কিংবা বিলম্বিত ছন্দে দ্যুতিময় হয়ে উঠলো তার নৈঃসঙ্গ্যবোধ : ‘মনের সারস হাঁটে মন্ডুর সঙ্কায় একাকী’। মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধু ব্যক্তিগত অনুভবের সীমায় বাঁধা পড়েনি এই বোধ : সময় স্বদেশ প্রেম এমনকি পরিব্যাপ্ত পৃথিবীর মর্মেও ছড়িয়ে পড়েছে তার শিকড়। সদ্য-স্বাধীন স্বদেশে নিজেকে তাই শৃঙ্খলিত বলে অনুভব করেন কবি : ‘তুমি তো জানো সূর্যদেব, বন্দী জনসমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠেছে শৃঙ্খল-যন্ত্রণায়। স্বাধীন ঋতুর প্রান্তরে একটি চারা গাছও আজ পল্লবিত নেই।’ তার মনে হয় :

পোড়ো জমি খাল নদী পথ। শীতে মৃত শিশির ঝরে পড়ছে
সূর্যমুখীর ডালে ডালে; ফুল তবু ফোটে না! যেখানে হেমন্ত
রাত্রিশেষের ক্লান্ত পদধ্বনি শুনে শুনে শেফালি বালিকারা মৃত্যুবরণ
করেছে, সে মাটি এখন বন্ধ্য।

(স্বদেশ, উলুখড়ের কবিতা)

স্বদেশের এই বর্ণনায় হেমন্তের রাত্রি, শীত, ঋতু, শিশির, মৃত্যু, পোড়ো জমি ও বন্ধ্য মাটির উল্লেখ আমাদের জীবনানন্দ ও এলিয়টের কথা মনে পড়ে যায় সহজেই। ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার বোধ দৈশিক গটভূমিতে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে আরো। কিন্তু কবি জানেন এই অবক্ষয়ের উৎস কোনখানে। তাই শাসকশ্রেণীর স্বরূপ উন্মোচনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন তিনি। কবি লক্ষ্য করেন রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি যে শুধু মানুষী অস্তিত্বের বিরোধী তাই নয়, গুটিকল্প মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই রক্ষা করে চলে এই রাষ্ট্রনীতি। সমাজবাদে দীক্ষিত কবিচেতনা অবশ্য এরকম আপাত পর্যবেক্ষণ নয়, আরো গভীরে প্রবেশ করে উপলব্ধি করে যে, দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাই এই নেতিবোধের প্রধান কারণ। বস্তুত এভাবেই বস্তুনিষ্ঠ, জাগতিক চেতনায় সামাজিক-বাস্তবতার তীব্র বোধে মূল সমস্যাস্পর্শী হয়ে উঠতে থাকে কবির চেতনা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবিষ্কার করেন স্বদেশের দীর্ঘ রূপ, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষের ভঙ্গুর আত্মরূপ। আর ‘রুটি দাও / অবশেষে এ কী অগ্নিগর্ভ কালবৈশাখী গান।’ একারণেই তিনি দেশবিভাগের মতো অমানবিক, অস্তিত্বের বিরোধী রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেন না, দ্বিখণ্ডিত মাতৃ-ভূমিকে প্রশুবিদ্ধ করেন ‘রূপকথা’ কবিতায়। পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পান না স্থিরতর কোনো ভূমি, এমন কি সাম্যবাদী রাজনীতিতেও নয়। তবে দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসেন নি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাটি আর মানুষকেই পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি^{২০} এবং ঐ উপলব্ধির সূত্রেই তাঁর কবিতায় এসেছে স্বদেশ-ভাবনা। মানবিক প্রেমের প্রতি কবির যে-পক্ষপাত তা ঐ চেতনার সম্প্রসারণ বলে ভেবে নেওয়া যায় :

মোহনিয়া বন্ধুরে, আমি বালিকা
 তোরই লাগি গান গাই, গাঁথি মালিকা
 ‘আজও সন্ধ্যার শেষে খালি বিছানা ;
 আমি শোব, পাশে মোর কেউ শোবে না—
 তুই ছাড়া এই দেহ কেউ ছোঁবে না।
 (গোধূলির সাঁওতাল, লখিমদর)

এও দায়বদ্ধতারই অন্যদিক। আদিবাসী নরনারীর সহজ নিষ্পাপ শরীরী প্রেমে তিনি যেন মানবিকতাকেই ছুঁয়ে ফেলেন গভীর জীবন-বোধে। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে মানবিক বা রোমান্টিক চেতনার সামুদ্রিক-সাধনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও অনন্য-সাধারণ সাক্ষ্যের অধিকারী। তবু প্রেমও যে সময়ের স্পর্শ লাগেনি, তা নয়। এক একবার তাঁর মনে হয়, প্রেম অপসৃত হৃদয় ‘শূন্য’। তবু মানবিক প্রেম বা ‘হৃদয়ের’ কাছেই তিনি পেয়েছেন আশ্রয়, অস্তিম ‘বরাভয়’। এই প্রেমচেতনা বা হার্দিক অনুভূতিই কবিকে উত্তীর্ণ করে দেয় মানবিক বোধে, ব্যক্তিক প্রেম তাঁকে নিয়ে আসে বিশ্বমানব-প্রেমের পথে :

উর্ধ্বে তুলে প্রত্যহ প্রভাতে
 দেখেছি এক মহান আত্মা জ্বলছে অনিবার্ণ
 তোমার, আমার, সবার মুখে গভীরতর আলো দিতে,
 পরিশুদ্ধ মানবতাই জীবন।
 (স্বৈতকালদের জন্য, লখিমদর)

কবি জানেন অবক্ষয় অর্থ আত্মবিলাপ নয়, আত্মসমালোচনা। তাই ‘নরক দর্শনের’ পরেও অবিনাশী তাঁর অস্তিবোধ।^{২১} আসলে এই অস্তিবোধেই ‘জীবনের সমগ্র ব্যাপ্তি’তে অবসাদ ও বিচ্ছিন্নতাজনিত রোমান্টিক অনুভব থেকে ব্যক্তিপ্রেমে এবং ব্যক্তিপ্রেম থেকে সুগভীর মানবপ্রেমে উত্তরণ ঘটলো তাঁর। মাঝে তিনি পেরিয়ে আসেন রক্ত-ক্ষতচিহ্নিত এক উপলব্ধির পথ। বস্তুত এই পর্বে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় যে জীবনাসক্তির সূচনা, পরবর্তী সময়ে তাঁর রচনায় চোখে পড়ে সেই প্রাণসর চেতনারই শিল্পসম্মত আধুনিকোত্তর রূপ।

অরুণ মিত্রের লক্ষ্যও মানবমুক্তি। তবে শুধু এ কারণেই নয়, অন্তর্নিবিষ্ট মগ্নচেতনাস্রোত অথবা অন্তঃশীল অনুভবের স্বগতোক্তিমূলক উচ্চারণে তিনি চল্লিশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। যদিও তাঁর প্রজন্মের অন্যান্য কবির মতো অরুণ মিত্রেরও আবির্ভাব ঘটেছিল বহিমুখী ঘটনার সরব ঘোষণায়, বাংকারে, তবু অচিরেই তিনি পঞ্চাশের পর্বে এসে খুঁজে পেলেন প্রকরণ ও প্রসঙ্গের আত্মতা (identity)। পঞ্চাশের দশকে পদা-র্পণের সঙ্গে-সঙ্গে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন নিজেকে। সরে এলেন মার্কসবাদী যান্ত্রিকতা থেকে। কিন্তু কেন এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে সরে এলেন তিনি? প্রত্যুত্তরে নিজেই জানাচ্ছেন: ‘কবিতা বা যে-কোনো শিল্প রচনার কাজ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে দল বা আন্দোলনের কোনো ভূমিকা নেই। তবে সাহিত্যে বারেবারে দেখা যায় আন্দোলনের পর্ব। তার তাৎপর্য আছে’। তবে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেও অরুণ মিত্র দায়বদ্ধতা অর্থাৎ মানবমুক্তির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি: ‘সেদিনের মতন আজও আমার মনে হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবমুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা আছে কারণ আধুনিক সাহিত্য মানুষের ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে সার্থকতা লাভ করতে পারে না’।^{২২} অর্থাৎ এর অর্থ হল মতাদর্শগত আবেগ নয় মনের গহন তল থেকে উঠে আসা আবেগ দিয়েই তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন জীবনকে। যেমন:

দু’মুঠো লাল ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন এখনও মাথা আছে,
এই কয়েক মিনিট আগে সবাই তাতে মুখ দিয়েছে

এবং যথারীতি কুঁজো হয়ে ঘামের ফোঁটা ফেলে জমেছে এসে মশানে।

(চিতা, উৎসের দিকে)

এখানে সমকালের শ্রমজীবী মানুষ তার জীবন ও জীবিকার সঙ্গে কবির যন্ত্রণাবোধটি বিমিশ্র হয়ে গেছে। বস্তুত এই মমত্ববোধের- কারণেই তিনি অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করতে পারেন : ‘আমি কোলা-হলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি/এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি মানুষ’। ফলত অরুণ মিত্রের কবিতায় বুদ্ধি ও যুক্তি শাসিত জীবনের বাইরে এমন এক জীবনকে ছুঁয়ে দেখবার আর্তি ফুটে ওঠে যা প্রেমময় ও ধ্যানী। আর এই সদর্থক জীবনদৃষ্টি থেকেই তাঁর মনে জাগে মর্তপ্রীতির বোধ। লোকালয় থেকে লোকালয়ে ভেসে বেড়িয়ে শেষাবধি মাটিতে কবি প্রোথিত করেন তাঁর নিজের সত্তা :

আমি হাতে হাতে ভেসে এসে থেমেছি
মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি
ফুফুসস ভরে নিয়েছি মহুয়ার আর ধানের বাতাস
আমের বোলের বাতাস
মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি অঙ্কুর আর কিছু নয়
(আর এক আরম্ভের জন্যে, উৎসের দিকে)

নিসর্গের ঐশ্বর্যমণ্ডিত বর্ণনাতেও ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রেম, মুগ্ধতার রেশ। বিরাগ বা ক্ষোভের মুহূর্তেও নিঃশেষিত হয়ে যায় না প্রেমানুভূতি, বরং তা হয়ে ওঠে আরো ঘন ও ইন্দ্রিয়স্পর্শী :

আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালো-বাসার ভোর একমুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা কথার শূন্য লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার। গড়বার আদর করবার, ফুলে ফলে কাকলিতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে গেল তা এই ক্ষোভে।

(এ জ্বালা কখন জুড়াবে, উৎসের দিকে)

লক্ষণীয় অরুণ মিত্রের উপজীব্য ঘটনাক্রম নয়, ঘটনাজাত আন্তর প্রতি-ক্রিয়াই তাঁর কবিতার মৌল অবলম্বন। সমকালের অমোঘ সত্যকে

তিনি অগ্রাহ্য করেন না, কিন্তু ঘটনার আপাত-আলোড়নের প্রখরতা নেই তাঁর কবিতায়। পারিপাশ্বিক কলরোল থেকে পরিশ্রুত জীবনসত্য-কেই তিনি আভাসিত করে দেন পাঠকের জন্য।

মাঝে মাঝে সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মবিচলনও ঘটে কবির কিন্তু জীবনের অস্তিবোধকে দীপ্ত রাখেন তিনি :

আমি এক পলকেই দেখে নিই

ভাঙাচোরা সমস্ত ঘর

ভরসার সমস্ত দুর্গ

কোনো বিদ্রূপের এত জোর নেই তাদের কখনো ধুলিসাৎ করে।

(আমার কাছে বদলে যায়, উৎসের দিকে)

এখানে যে রুক্ষ, শূন্য জীবন ছড়িয়ে পড়ছে ‘মৃত্যুর গহ্বরে’ অচিরেই তা অপসৃত হয়ে গিয়ে ভরে উঠবে ‘সবুজের প্রতাপে’—এই হলো কবির প্রত্যয় :

কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হয়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার বিলিমিল মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরে বাপটানি।

(অমরতার কথা, উৎসের দিকে)

শুধু নতুন জীবনের বিকাশ নয় অস্তিত্বচিন্তনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আত্মবিদারণ সূত্রে কবি ‘প্রেমের নাড়ী নক্ষত্র’ চিনে নেবেন। অরুণ মিত্রের এই পর্বের কবিতায় জীবন তাই ব্যবহারিক বা জনজীবনের সঙ্গে সংলগ্ন হলেও ব্যক্তিহৃদয় অনুশোচিত থাকে নি সেখানে। ব্যক্তির হৃদয় উচ্চারণে ফুটে ওঠে প্রগাঢ় সমাজচেতন্যের ইশারা। এই হৃদয় আকর্ষণের হেতু তাঁর কবিতার ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে অন্তরঙ্গ রেশ, মগ্নচেতনাস্রোত। বস্তুত অরুণ মিত্রের কবিতার ভাষা ঐ মগ্নচেতনাস্রোতের অনুবর্তী বলেই গাঢ় অক্ষুট স্বরঞ্জেপের প্রতি এই কবির রয়েছে এক ধরনের সহজাত আকর্ষণ। কবিতায় গীতিময় গদ্য বা প্রত্যক্ষ গদ্যরীতি গ্রহণের পেছনেও যে জীবনকে প্রসারিত করে দেবার ভাবনা কাজ করেছে তাও আর গোপন থাকে না আমাদের কাছে। গদ্যকেই তাঁর মনে হয় গভীর মানবিক

বিষয় প্রকাশের যথোপযুক্ত মাধ্যম বলে: ‘আমি তো কোনো কোনো সময় ছন্দে লিখতে গিয়ে দেখি জোলো লাগছে, তখন গদ্যে চলে আসি’।^{২৩} আর এ কারণেই ছন্দ-মিলকে তাঁর মনে হয় সংস্কার, কবিতার জন্যে ক্ষতিকারক কোনো উপাদান বলে।^{২৪} বস্তুত আজিকের এই অনিবার্যতা এবং প্রসঙ্গ-সচেতনতাই অরুণ মিত্রের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে ব্যক্তি-সামাজিকের টান এবং অন্যদিকে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর কবিতাকে যথাক্রমে মনীষার পরিবর্তে হৃদয়স্পর্শী এবং শূন্যতার বদলে প্রত্যয়দীপ্ত করে তুলেছিলো। কেননা তাঁর নম্র ‘খুব মৃদু কথাগুলো/একটি প্রতিজ্ঞার মতো গ’ড়ে ওঠে/এক বুক থেকে আর এক বুক/এক গলা থেকে আর এক গলায়’। অবশ্য ফরাসী কবিতার সংস্পর্শে আসবার ফলেই তিনি এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন বলে ধারণা করে নিতে পারি আমরা। এর সূত্রপাত মূলত পঞ্চাশের দশকে ‘উৎসের দিকে’ নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে। পরবর্তীকালে অরুণ মিত্রের কবিতায় লক্ষ্য করা যায় এই দায়বদ্ধ চেতনারই শিল্পসম্মত গহনস্পর্শী সম্প্রসারণ, যার পরিণামে আধুনিকতা থেকে আধুনিকোত্তর ধারণায় উদ্ভীর্ণ হয়ে যাবে এই কবির রচনাবলি।

অরুণ মিত্রের মতোই চল্লিশের আর একজন উল্লেখযোগ্য দায়বদ্ধ কবি হচ্ছেন সিদ্ধেশ্বর সেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি যেমন খুঁজে পেয়েছিলেন নিজস্ব কণ্ঠস্বর তেমনি তাঁর কবিতার প্রসঙ্গেও দেখা দেয় বিপুল বৈচিত্র্য।

কবির নিজের ভাষা অনুসারে এই পর্যায়ের প্রথম কবিতা ‘আমার মা’-কের রচনার শুরু ১৯৪৯-এর শেষ দিকে একদিন, ‘আটকাধীনের একাকীত্বে’^{২৫} এবং লেখা শেষ হয় ১৯৫০ সালে। একটু সচেতন হলেই দেখা যাবে যে, দীর্ঘ এই কবিতাটিতে মা হয়ে উঠেছে স্বদেশের প্রতীক। কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত শোকানুভূতির সঙ্গে অবক্ষয়পীড়িত স্বদেশকে একত্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এই রচনায়। ফলে এখানে সমকালের বহিমুখী ঘটনা ও অন্তর্গত উপলব্ধির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় সহজেই। যদিও কবিতাটি আবেগের উঁচু তারে বাঁধা, কিছুটা হয়তো অতিরিক্তন দোষে দুষ্ট।

পরবর্তী স্তরে কবি অবশ্য ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে পৌঁছলেন ব্যক্তির একান্ত অজ্ঞাতবাসে। এই পর্যায় থেকেই ব্যাপক আত্ম-উন্মোচন ঘটছে তাঁর: ‘আমার পরিধি আমি বাড়িয়ে দিলাম অগাধ বিস্তারের ভিতর’। সারা পৃথিবীব্যাপী মুক্তিসংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণাও অনুভব করলেন তিনি। ‘আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে বাঁধা/আমার শিকড় তোমার মাটিকে খোঁজে আমার দিন চায় তোমার রাত্রির সাড়া বলো, কোন ভাষায় কথা বলব?’—এই আত্মপ্রশ্নে নিজেকে বিদ্ধ করার পর দুঃখ-জয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগলো তাঁর মনে। সমকালীন ঘটনা থেকে ব্যক্তিসংকটের কাছাকাছি সরে এলেন তিনি। কবির চলা যেন এখন জন্ম-মৃত্যুর পথে। ফলে, প্রগলভতা নয়, ঈষৎ অনুচ্চারে সবকিছু অনুভব করতে চাইছেন কবি: ‘আমি কোনো কথা বলবো না, অনুভব করব...’। কথাকে তাই তিনি বহির্জাগতিক অভ্যাস থেকে, বিনশ্টিত তাপ থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন বীজমস্ত্রে:

আমার চুপিসাড়া কথাকে আমি

নামিয়ে দিই

বিনশ্টিত পাপ থেকে আগলে রেখে

নামিয়ে দিই

ততদূর, যেখানে মাটির আতুল গর্ভাধানে

বীজমস্ত্রে স্তব হচ্ছে।

(অবিচ্ছিন্নতায়, উৎসের দিকে)

কবি জানেন কবিতা এবার তাই বোধের কাছাকাছি সরে আসবে অনেকখানি। ফলে যে দায়বদ্ধতার স্তব তিনি করেন তাতে আর নেই কোনো কোলাহল: ‘আমার নিমগ্নতার মধ্যে তোমায় ডেকেছি/কোলাহলের চেউ সরে গিয়েছে অনেক দূরে’। বস্তুত এভাবেই কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন আত্মসত্তার মর্মমূলে। কেননা তিনি চান ইতিহাসবোধে প্রোথিত হয়ে অতীত ও বর্তমানকে অভিন্নসূত্রে গ্রথিত করে পূর্ণতা ফিরিয়ে আনতে:

আমি তার দিকে রিস্ত হয়ে ফিরে যাই

পূর্ণতা ফিরিয়ে আনব বলে

আপন সত্তার জাগরণে আমি তার সুপ্তিকে মিলাই

মিলাই অতীত এই দৃশ্য বর্তমানে।

(একটি অতীত, উৎসের দিকে)

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সিদ্ধেশ্বর সেন শুধু উপরিতলের চেতন-
স্তর দিয়ে নয়, জাগরণ ও সুপ্তির, চেতন ও অবচেতনের অন্তর্গত
বোধ দিয়েই উপলব্ধি করতে চাইছেন সবকিছু। যদিও তাঁর ধর্মণীর
'শ্বেত ও লোহিত রক্ত কণিকারা সংঘম' শৃঙ্খলা ভুলে স্বকের বাঁধন ছিঁড়ে
ফেলতে চেয়েছিল' তবু তাঁর ভাষায় : 'কালরাগ্নি আমি পৃথিবীর আশ্রয়ে
স্পন্দিত ছিলাম ঘুমে নয়, অস্ফুট জাগরণে, আমাদের গবাক্ষ বাতায়ন
ধুয়ে ধুয়ে দিয়েছিল প্লাবিত জ্যোৎস্না'। বস্তুত এভাবেই পঞ্চাশের দশকে
দায়বদ্ধতার প্রতি 'শেষ প্রভাময়' উপস্থিতি ঘটে কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের।
মাঝে মাঝে অতিকথন বা বিরতিধর্মিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হলেও শব্দ
ও প্রতীকের সতর্ক ব্যবহার, খণ্ড বাক্য ও মিতকথনের আশ্রয় নেওয়ার
ফলে তাঁর কবিতা অকারণ বক্তব্যের ভারে নুয়ে পড়েনি বরং তা হয়ে
উঠেছে তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী।

সংহত ঋজু বাকভঙ্গি এবং সহজ শব্দের সরাসরি সমীকরণে মণীন্দ্র
রায় তাঁর কবিতায় যোজনা করে দিয়েছেন দায়বদ্ধ কবিতার ভিন্নতর
মাত্রা। চল্লিশের দশকে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনিও ছিলেন গভীর-
ভাবে আশাবাদী। কিন্তু এই পর্বে তাঁর কবিতায় দেখা দিয়েছে নিরাশার
ছায়া, দৃঢ় সামাজিক অবক্ষয়ের ইশারা। দেশকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতি
তাকে এই অনুভবের নিকটবর্তী করে তুলেছে।

অন্যদিকে রাম বসুর কবিতার প্রধান প্রেরণাশ্রুত গ্রাম ও গ্রামের মানুষ,
তিরিশের নাগরিকতা নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ স্পৃহার
সঙ্গে-সঙ্গে নিসর্গ হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয়। প্রকৃতিকে
তার ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভূমিকা থেকে সরিয়ে এনে যুক্ত করে দেন সমকালীন
সংগ্রামের সঙ্গে; এই নিসর্গ-সচেতনতাই আবার সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়
কবির স্বদেশ-ভাবনায়। চল্লিশের অন্যান্য কবিদের মতো একান্ত
ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাতেও রাম বসু সঞ্চারিত করে দিয়েছেন দেশ-
প্রেমের এই বোধ। ফলে দেশ-নিসর্গ-প্রেম-প্রতিরোধ পরস্পর বিজড়িত
হয়ে গিয়ে রচনা করে দায়বদ্ধ কবিতার এক যথার্থ পরিমণ্ডল। নির্বা-
রিত আবেগ ও তারুণ্যের উল্লাসধর্মিতাই এই পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে পালন
করে মৌল ভূমিকা। তবে রাম বসুর বিশিষ্টতা আবেগ-নির্ভর, হৃদয়-
মথিত ভাবনার দ্রুত চালে, বিস্তারপ্রবণ কল্পনাচারিতায়, প্রতিমা ও শব্দের

অভাবনীয় ক্ষিপ্ৰ ব্যবহারে। ছন্দের দিক থেকে গদ্য ও পদ্য এই উভয়-বিধ ছন্দের ব্যবহার করেন তিনি। কিন্তু বক্তব্যের প্রবল চাপের কারণে তুলনামূলকভাবে গদ্যছন্দেই স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পেরেছেন বেশি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও বক্তব্যের অবিরল চাপ বা বিরতিধর্মিতার মোহ থেকে সরে আসতে পারেন নি এই পর্বে। তবু তাঁর লিরিকধর্মী শান্ত উচ্চারণ কখনো-কখনো পাঠককে ছুঁয়ে যায়। হয়তো হৃদয়ধর্মের প্রতি নিজেকে নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন বলেই চল্লিশের প্রচারপ্রবণ ভাষায়তনিক প্রার্থ্য আর তিরিশের মনীষিতা থেকে সামান্য হলেও মুক্তি ঘটেছিলো তাঁর। দেশ-বিভাগ, উদ্ধাস্তু-সংসার, নিচুতলার মানুষ, ভুখ মিছিল, স্বদেশের করুণ-রিক্ত ছবি এবং এইসব সমস্যা থেকে উদ্ভূত অস্তঙ্কাল ও যন্ত্রণা মঙ্গলাচরণের কবিতাকে দিয়েছে চল্লিশেরই দায়বদ্ধ কবিতার ভিন্নতর এক প্রতিষ্ঠা:

ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্য ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মতো এক কোণে বউ, দুয়োরে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।

এক যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে—ছেলে মা
ঘর-যে তোমার ঘরে-ঘরে, জননী যন্ত্রণা
(জননী যন্ত্রণা, কটি কবিতা ও একলব্য)

অবশ্য অন্যসব কবিতার তুলনায় অতিকথনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ‘একলব্য’ নামক কবিতাটিই হচ্ছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ‘একলব্য’ এখানে শ্রেয়োবোধের প্রতীক, অন্যদিকে, ‘দ্রোণ’ রাষ্ট্রীয় কুটচাল ও শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। কবিতাটির পটভূমিও বিপুল বিস্তৃত; শুধু পৌরাণিক জগৎ বা সমকালীন স্বদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এর পটভূমি। ইতিহাসবোধের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে একে—‘ইতিহাস ইতিহাস-বাহন মানুষ’।

মানুষের স্বাধীনতা ও অনমনীয় সংগ্রামী স্পৃহার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের যে-দ্বন্দ্ব তাই এই কবিতার উপজীব্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে সমরণ

করা যেতে পারে একলব্যের একটি উক্তি : ‘ছায়াশরীর রাষ্ট্র। / পায়-পায়ে শাস্ত্রী ; রাজবেশ অঙ্গে, রাষ্ট্র ; রাষ্ট্র চলনেবলনে, রাষ্ট্র : / রাষ্ট্র যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।—যন্ত্র কি জীবন ?’ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বদেশের রূপ ধরা পড়েছে এই উক্তিতে। আবার মধ্যবিত্তের দোলাচলধর্মী মনোভঙ্গিটিও বহন করছে দ্রোণের কোনো কোনো উক্তি। কিন্তু কবি এতদিন যে-যন্ত্রণা পেয়ে আসছিলেন কবিতাটির শেষাংশে একলব্যের আপোষহীন সংগ্রামে তার মুক্তি ঘটছে, নির্দ্বন্দ্ব চেতনায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন তিনি, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠছেন একলব্য : ‘আজ রাত্রি কেউটের ছোবল, তার বিষ তার বিষের দহন নীল রাত্রি / ...’ এ রাত্রির মাঝখানে শুয়ে আছে একলব্য : রক্তস্নানে সম্পূর্ণ মানুষ’। বলতে দ্বিধা নেই ঐতিহ্য ও পুরাণের অনুসরণে এই কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। কবিতায় এই সাফল্য কীভাবে অর্জিত হতে পারে সে সম্পর্কে মঙ্গলাচরণের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : ‘কি প্রকরণ, কি ভাববস্তুর বিচারে কবিতা রচনা একই সঙ্গে ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সম্প্রসারণ এবং সেই ঐতিহ্য উল্লঙ্ঘনের এক বিচিত্র জটিল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। ব্যাপারটিকে অন্যভাবেও বলা চলে। প্রত্যেক দেশে ও কালে ব্যক্তিসত্তার একদিকে অতীত ইতিহাসের এবং অন্যদিকে সমকালীন সমাজের মিল ও বিরোধের টানাপোড়েনেই কবিতার জন্ম’।^{২৬}

তথ্যনির্দেশ

- ১ অরুণকুমার সরকার, তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী, প্যাপিরাস, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১৩-১৪
- ২ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কাব্যদৃষ্টি ও সময় সেনের তিনপুরুষ, ‘পরিচয়’ পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৫২
- ৩ অরুণ মিত্র, শিল্পীর দায়বদ্ধতা, ‘আজকাল’, ২৩ জুলাই ১৯৮৫
- ৪ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, ‘বিজ্ঞাপন পর্ব’, ত্রয়োদশ বর্ষ সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৯২
- ৫ সুমিত্রা চক্রবর্তী, প্রগতি-আন্দোলন ও অরুণ মিত্রের কবিতা, কবি অরুণ মিত্র, সম্পাদনা শঙ্কু ঘোষ/অরুণ সেন

- ৬ ইভতেশেকো, সাক্ষাৎকার, কে. এস. ক্যারোল, L'Express, ২৪শে মে, ১৯৬২
- ৭ দ্রষ্টব্য C M Bowra, *Poetry and Politics* 1900-1960, pp 117
- ৮ John Philling, Pablo Neruda, *An Introduction to Fifty Modern European Poets*, Pan Books Ltd., London, 1982 pp 335
- ৯ C M Bowra, প্রাপ্ত, পৃ. ৩৩
- ১০ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কী ক'রে কী ক'রে, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯
- ১১ প্রাপ্ত
- ১২ প্রাপ্ত
- ১৩ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, অন্যান্য, শরতকালীন সংখ্যা ১৩৭৬
- ১৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯
- ১৫ প্রাপ্ত
- ১৬ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞাপন পর্ব, ত্রয়োদশ বর্ষ সংখ্যা ১ আশ্বিন ১৩৯২
- ১৭ এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে লেখা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি গদ্য এবং কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি : ক. 'বিপ্লবী না হয়েও বিপ্লবিত-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা জীবনানন্দ দাশ প্রগতিশীল সাহিত্যের ভূমিকা কিছুটা পালন করতে পেরেছেন'... ।' সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞাপন পর্ব, প্রাপ্ত। খ. 'মৃত্যু প্রস্তর হাতে নিয়ে অপরূপ মূর্তি গড়ে সত্তার নির্ভূতে প্রণয়ে সে বিবাহিত' (জীবনানন্দ দাশ, মৃত্যুভীর্ণ)।
- ১৮ দ্র. 'লখিমদর' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'নজরুল ইসলামকে নিবেদিত'
- ১৯ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞাপন পর্ব, ত্রয়োদশ বর্ষ সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৯২
- ২০ প্রাপ্ত

২১ প্রাপ্ত

২২ অরুণ মিত্র, শিল্পীর দায়বদ্ধতা, 'আজকাল', ২৩ জুলাই ১৯৮৫

৩৩ অরুণ মিত্র, সাক্ষাৎকার, অন্যান্য, 'শরতকালীন' সংখ্যা ১৩৭৬

২৪ অরুণ মিত্র, 'কবিতা, আমি এবং আমরা', 'পরমা', শরৎ-হেমন্ত
১৩৮৪

২৫ সিদ্ধেশ্বর সেন, ভূমিকা, সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা, 'পরিচয়', কলকাতা

২৬ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'পরিচয়', আশ্বিন ১৩৬৯